সবিনয় নিবেদন

বুদ্ধদেব বসুর "আধুনিক বাংলা কবিতা" প্রকাশের পর একটা দুরন্ত ঝোঁক যেন বাঙালীকে পেয়ে বসেছে। দুপাঁচটা সঙ্কলন ব্যতিরেকে বাংলা কবিতার বছর কাটে না। আমাদের "গাজনের গান"ও বোধহয় সেই অনিবার্য স্রোতেরই ফসল।

কিন্তু উদ্যোগ নেবার পরই বাংলা কবিতার বিপুলকায় উজ্জ্বল প্রতিকৃতির কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হল। কেবলমাত্র গ্রহণ-যোগ্য কবির সংখ্যাই যে কোনো প্রকাশকের হৃৎপিণ্ড থামিয়ে দিতে পারে। ফলে, পরিকল্পনা পাল্টাতে হল। প্রামাণিক হবার মতো অসম্ভব অভিযানে বিরত হলাম। অতএব অকপটে স্বীকার করছি, এই গ্রন্থ কেবলমাত্র সম্পাদকের ভালো লাগার দর্পণ। আর সেই কারণেই সম্ভবতঃ কয়েকজন তথাকথিত অখ্যাত কিংবা অল্পখ্যাত কবির উপস্থিতি পাঠককে কিছুটা বিস্মিত করবে। কিন্তু তার চেয়েও হয়তো আরো বেশি ধাক্কা দেবে কয়েকজন বিশিষ্ট কবির অন্যায় অনুপস্থিতি। বলতে দ্বিধা নেই, অনেক স্মরণীয় কবিতা লিখলেও আমাদের বর্তমান সঙ্কলনের উপযোগী কবিতা তাঁদের খামার থেকে আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। সবিনয়ে আমরা তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কবির জন্মসনের নিরিখে আমরা কবিতা নির্বাচন করেছি। সময়-সীমা ১৯০১ থেকে ১৯৫১। কেবলমাত্র জীবিত কবির কবিতাই গ্রন্থিত হয়েছে। মোট ৬৪ জন কবির ৬৪টি উজ্জ্বল চিৎকার আমরা গাজনের মেলার মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম। অন্তত একজন পাঠকও যদি বিন্দুমাত্র আন্দোলিত হন—আমরা পুরস্কৃত মনে করব।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১

বড়োবাবুর কাছে নিবেদন ৯

প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪

তাদের জন্যে ১০

অন্নদাশংকর রায় ১৯০৪

খুকু ও খোকা ১১

বিষ্ণু দে ১৯০৯

একটি অসম্পূর্ণ কবিতা ১২

অরুণ মিত্র ১৯০৯

পতন ১৩

বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৯১০

শিরদাঁড়া ভেঙে দিলে সোভিয়েতকে ১৪

দিনেশ দাস ১৯১৫

কাস্তে ১৫

সুশীল রায় ১৯১৫

জীবন ১৬

সমর সেন ১৯১৬

রোমন্থন (২) ১৭

হরপ্রসাদ মিত্র ১৯১৭

বড়ো সায়েব ১৮

কিরণশংকর সেনগুপ্ত ১৯১৮

রাজা ১৯

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯

মে-দিনের কবিতা ২০

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২০

রাত্রি, কালরাত্রি ২১

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২১

রক্ত, রক্ত ২২

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৪

এশিয়া ২৩

জগন্নাথ চক্রবর্তী ১৯২৪

সে, বৃক্ষ এবং আমি ২৪

অরুণ ভট্টাচার্য ১৯২৫
সমর্পিত শৈশবে ২৫
রাম বসু ১৯২৫
যখন যন্ত্রণা ২৬
অমিতাভ চৌধুরী ১৯২৭
ছড়ার কলকাতা ২৭
সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ১৯২৭
বাঘের পিঠে ২৮
কৃষ্ণ ধর ১৯২৮
আমরা আসছি ২৯
সিদ্ধেশ্বর সেন ১৯২৮
নিষ্ঠুরতা ঘটে গেছে ৩০
অরবিন্দ গুহ ১৯২৮
হত্যাকারী ৩১
সুনীলকুমার নন্দী ১৯৩০
বিষ ৩২
সুনীল বসু ১৯৩০
অসম্ভব দুজন ৩৩
কেদার ভাদুড়ী ১৯৩০
অদ্ভুত সমাজ এই ৩৪
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩১
অবাধ্য বালক ৩৫
শঙ্খ ঘোষ ১৯৩২
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় ৩৬
আলোক সরকার ১৯৩২
আড়চোখে ৩৭
পূর্ণেন্দু পত্রী ১৯৩২
ডাকো ৩৮
কবিতা সিংহ ১৯৩২
যাক ভিখারিনী ৩৯
সলিল লাহিড়ী ১৯৩২
নতজানু কেন ৪০

গৌরাঙ্গ ভৌমিক ১৯৩২
অশুভ সঙ্গীত ৪১
আনন্দ বাগচী ১৯৩৩
আজকাল ৪২
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৯৩৩
ঈশ্বরের প্রতি ৪৩
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৩
প্রত্যাবর্তিত ৪৪
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩৪
যবনিকা সরে যায় ৪৫
জয়ৎ সেন ১৯৩৪
কাগ ৪৬
সাধনা মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪
বিপ্লব জিন্দাবাদ ৪৭
বিনয় মজুমদার ১৯৩৫
একটি কবিতা ৪৮
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯৩৫
ত্যাগ ৪৯
অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৯৩৫
স্বদেশ ৫০
প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১৯৩৬
সুদিনের জন্য ৫১
তারাপদ রায় ১৯৩৬
অপ্রাকৃত কবিতা ৫২
মণিভূষণ ভট্টাচার্য ১৯৩৬
গান্ধীনগরে একরাত্রি ৫৩
সামসুল হক ১৯৩৬
আমার সমাধির উপরে পা দিয়ে ৫৪
বাদল ভট্টাচার্য ১৯৩৬
বাঁচার সাধ ৫৫
রত্নেশ্বর হাজরা ১৯৩৭
কোথায়—কোন্‌দিকে ৫৬

তুলসী মুখোপাধ্যায় ১৯৩৭
পূনর্জন্ম চাই ৫৭
গৌতম গুহ ১৯৩৭
ঘর বাঁধছে ৫৮
মতি মুখোপাধ্যায় ১৯৩৭
কেয়ার অফ্ গাছতলা ৫৯
নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৭
আশ্রয় ৬০
বিজয়া মুখোপাধ্যায় ১৯৩৭
ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম ৬১
আশিস সান্যাল ১৯৩৮
এ কোন্ ভারতবর্ষ ৬২
নবনীতা দেবসেন ১৯৩৮
ও কিছু নয় ৬৩
আনন্দ ঘোষহাজরা ১৯৩৯
চিত্রকল্পের বিরুদ্ধে ৬৪
অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৯
এখানে ৬৫
সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪২
রক্ত একই রক্ত ৬৬
শান্তনু দাস ১৯৪২
আকাট ৬৭
মৃণাল বসুচৌধুরী ১৯৪৪
আতঙ্কবিহীন ঘুম ৬৮
শিশির গুহ ১৯৪৪
কেন ৬৯
ভাস্কর চক্রবর্তী ১৯৪৫
প্রার্থনা ৭০
সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫১
আমার সত্যি আমার মিথ্যা ৭১
শ্যামলকান্তি দাশ ১৯৫১
সমাজ ভাঙার শব্দ ৭২

অমিয় চক্রবর্তী

বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরানি।
বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকরের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের ত্বপুরে বৃষ্টি।
আপন জনকে ভালোবাসা,
বাংলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা।

তাড়াও সংসার, রাখলাম,
বুকে ঢাকলাম
জন্ম জন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়
তুলসী-মণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়
থার্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জানালায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলাগাছ, কুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, ত্ব-পাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
স্নুন্দরফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,
গঙ্গার ভরা জল ; ছোটো নদী ; গাঁয়ের নিমছায়াতীর—
হায়, এও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।

শত শতাব্দীর তরু বনশ্রী
নির্জন মনশ্রী :
তোমায় শোনাই, উপস্থিত ফর্দে আরো আছে—
দূর-সংসারে এলো কাছে বাঁচবার সার্থকতা॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র
তাদের জন্যে

সাবধান হবার সময় এসেছে বন্ধুরা
ওরা মুখ দেখে মুখোস বানাতে শিখেছে,
শিখেছে মুখস্থ বুলি
উচ্চকণ্ঠে অনর্গল আওড়াতে।

দিগন্তে জ্বলন্ত লাল ছোপ দেখলে
তাই আর সূর্যোদয় বলে
উদগ্রীব হয়ে উঠিনা।

শঙ্কিতসন্দেহ হয়
ও হয়ত কোনো সর্বনাশা দাবানলের!

মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে
বাঁধা বুলির ধরতাই ধ'রে
চিৎকারে যারা আকাশ ফাটায়
রাস্তা কাঁপিয়ে
যূথবদ্ধ পদভারে
তাদের মুখগুলো যেন মনে হয় মুখোস।

গলাগুলো যেন শুধু গ্রামোফোনের চোঙের
না আমি তাদেরই খুঁজছি
যারা ঘুঁসির হাত ছুঁড়ে
আস্ফালন করে না
করে না গগনভেদী বজ্রনাদের নকল।

কথা বলে যারা গাঢ় গভীর স্বরে
আর হাত মেলাবার জন্যে
খোলা হাতই দেয় সাদরে শুধু বাড়িয়ে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা ?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি।
তার বেলা ?

চায়ের বাগান কয়লা খনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর,
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর।
তার বেলা ?

যুদ্ধ জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট,
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট।
তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো,
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা ?

বিষ্ণু দে

একটি অসম্পূর্ণ কবিতা

পঙ্গু অকর্মণ্য ভালো, সোজাসুজি অসৎ পীড়িত—সেও ভালো,
এই কথা ভারতের একমাত্র জীবন্ত সাহসী দল বলে,
সেদিন রাত্রি-টা যবে আমরা কয়েকজনা কাটাই জঙ্গলে,
আগুন নিভিয়ে, শুধু জেলে লক্ষ গৃহহীন নক্ষত্রের আলো।

হালুমেরা বলে : তারা হিট্‌লারের শিষ্য নয় অথবা মুসোর,
ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলে : ফুটোফাটা আছে, থাক পাঁচিলে দেয়ালে,
সেই ফাঁকে মুক্তি পাই আজো তাই—পায় বটে শকুনে শেয়ালে,
মালুম ওদের দৌড়—চুপি চুপি কাটা মড়া ঘাঁটা বড় জোর।

অরুণ মিত্র

পতন

জায়গাটা পিছল বড়, পড়ছে তো পড়ছেই
আগুয়ান মূর্তিগুলো,
মনে হয় বিপুল নেশার ঘোর লেগে গেছে।
পড়া দেখতে দেখতে চোখ ভঁরে আসে,
থামুক না এবার বিষম পাতালী খেলা :
নইলে আমি শেষ পর্যন্ত হয়তো অন্ধ হব।
তখন কি আকাশে আর
সুলক্ষণ দেখা যাবে ?
তখন কি এমন মুখ আর দেখা যাবে
যাকে আমি প্রদীপ্ত ফোটাতে চাই তোরণের নিচে ?

বিমলচন্দ্র ঘোষ

শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিলে সোভিয়েতকে

ঠিক সময় ঠিক জায়গায় তুমি এসে দাঁড়াও।
অপরাজেয় লোকশক্তি
অপরিমেয় কল্যাণশক্তি
তোমার বিশাল সত্তার স্বরূপ।

তুমি না থাকলে পাপ মাত্রা ছাড়িয়ে যেত,
স্পর্ধা সূর্যেরও মুখে চুনকালি মাখাত,
সুড়ঙ্গের পাঁক বেয়ে নাজী-ফ্যাসি সরীসৃপগুলো
কিলবিল ক'রে বেরিয়ে আসত
শান্তিময় সৃষ্টির সংসারকে
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরতে।
মাথা তোলবার আগেই আজ তুমি
ঠিক সময়ে ওদের শিরদাঁড়া ভেঙে দিলে।

ভোঁতামুখ বুড়ো অজগরগুলো ফোঁস ফোঁস করছে
আর ওদের কুণ্ডলীর মধ্যে আশ্রিত
মুক্তিপ্রেমিক অজকুলোদ্ভবরা ব্যা! ব্যা! করছে:
"গেল, গেল চেকোস্লোভাকিয়া!"

দিনেশ দাস

কাস্তে

বেয়নেট হোক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু !
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে !

ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
কাল যারা করেছিলো পূর্ণ,
কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে
আজ তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ ঃ

চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
গ'লে পরিণত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে !

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই ! চেয়ে ছাখো বন্ধু !
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা, বন্ধু !

সুশীল রায়

জীবন

নাটক বা উপন্যাস, ছোটগল্প অথবা কবিতা—
এসবের সঙ্গে নাকি জীবনের যোগ থাকা চাই।
নাটক বা উপন্যাস, ছোটগল্প অথবা জীবন—
এসবের কোনোটাই নয় নাকি নিছক কবিতা।
প্রত্যেকের সঙ্গে কিন্তু আছে এই জীবনের মিলের বাহার
সকলেরই আছে উপক্রমণিকা ও উপসংহার।

কমা-সেমিকোলনের সঙ্গে যদি চাই পূর্ণচ্ছেদ
এসবের থেকে তবে জীবনের কোথায় প্রভেদ ?
গদ্য হোক পদ্য হোক এ জীবনও একটি রচনা—
যদি শেষ না'ই হল তবে তার কিছুই হল না।

কবিতা বা উপন্যাস, ছোটগল্প অথবা নাটক—
শেষ ছত্র চাও এর ? জীবনেরও তাই তবে হোক।
আমাদের চেষ্টা তাই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শুধু চলে অবিরাম
কবে পরিপূর্ণ হব, কবে হবে শেষ পরিণাম।

সমর সেন

রোমন্থন (২)

শূন্য মাঠে স্তব্ধ দিন।
যতদূর চোখ যায়, লৌহরেখা প্রসারিত
নির্বিকার অদৃষ্ট রেখায়।

অন্নজলহীন মৃত্যু হয়তো
ভবিষ্যতে হয়তো দুর্ভিক্ষ, চকিত প্লাবন।
তবু দেখি, ঝুড়ি-ঝুড়ি শাকসব্জি, সহজ সবুজ,
সপ্তাহে দু-দিন গ্রাম্য হাট বসে,
বেচাকেনা সাঙ্গ হলে হুঁকো-কলকে ঘন-ঘন হাত বদলায়,
মহাজন-চিন্তাহরা গন্ধ ছড়ায়।
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
অবোধ মন, বোঝানো ব্যর্থ।
পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোনা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।
আমার অজ্ঞাতসারে
পুরাতন প্রগল্‌ভ দিনরাত্রি আসা-যাওয়া করে,
নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে তিলে-তিলে পৃথিবী মরে,
বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর।

তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে ;
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

হরপ্রসাদ মিত্র

বড়ো সায়েব

বড়ো সায়েবের কষ্ট দেখে ছোটো সায়েবের উচ্চাশা
ফুরিয়ে আসে যখন, তখন মিলিটারি মা কালী,
রক্ষা করো, রক্ষা করো তবিলদারী ভয়ঙ্কর।
দশের সত্য এই যদি হয়, কোনো তন্ত্রেই বাঁচবো কি ?

বাঁচা মানে গা বাঁচানো—শেয়াল-মামার সুড়ঙ্গে
দলে কিংবা একা একাই, মাইনে বাড়াও সেপাইদের ;
খাজাঞ্চিজী চুপি চুপি বলেন, সবই বাড়ন্ত।
মা লক্ষ্মীর কৃপায় আসুক অফুরন্ত জগৎশেঠ।

বড়ো সায়েবের টেলিফোনের তার কেটেছে কারা সব,
বড়ো সায়েবের চারদিকে ঠিক বেলেল্লাদের মহোৎসব।
বড়ো সায়েবের জাঁক গেলে আর বড়ো সায়েবের থাকে কী
অনেকদিনের অবহেলায় ছিলই না তাঁর চরিত্তির।

কিরণশংকর সেনগুপ্ত

রাজা

মদমত্ত রাজা আজ ম্রিয়মাণ।   সহসা উৎসব
স্তব্ধ হলো প্রেক্ষাগৃহে, শতাব্দীর যুগ সন্ধ্যাকালে
রক্তহীন ঐশ্বর্যের শেষ চিতা নীলাকাশ জ্বালে,
রাজার মোতির মালা স্বর্ণহার ছিন্নভিন্ন সব!
পলাতক পারিষদ, চাটুকার আতঙ্কে ফেরার,
প্রদীপের আলো নেবে, নর্তকীর আশ্লেষ অসার,
পড়ে থাকে পানপাত্র, স্বাদ নেই অতৃপ্ত সুরার,
মণিময় কক্ষদ্বার শূন্য ঘর স্তব্ধ নিরুচ্চার!

বাহিরের পৃথিবীতে পিপাসার তীব্র অন্তর্জ্বালা
অগ্নি ঢালে চোখে-চোখে, শিহরিয়া ওঠে শুষ্কমূল :
অন্ধকারে দূর নীলে বহ্নিমান মশালের মালা,
শর্বরীর ভাঙ্গে ঘুম রক্তবর্ণ প্রাণের শিমূল।
ঘুম নেই, শ্রান্ত দেহ, রাজা এসে জানালায় বসে ;
অতর্কিত হাওয়া এসে তাড়া করে প্রচণ্ড আক্রোশে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মে-দিনের কবিতা

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাটফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

চিমনির মুখে শোনো সাইরেন-শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে,
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে।

প্রণয়ের যৌতুক দাও প্রতিবন্ধে
মারণের পণ নখদন্তে ;
বন্ধন ঘুচে যাবে জাগবার ছন্দে,
উজ্জ্বল দিন দিক্-অন্তে।
শতাব্দীলাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা ;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন-আত্মা॥

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি, কালরাত্রি

ভুবন ভ'রে গিয়েছে আজ
চোখের জলের সমারোহে ;
যে দিকে চাই ক্ষুধার সভা
নরক যেন যায় বিবাহে।

অথচ দশ দিক বিধবা
বোবার মতো দাঁড়িয়ে দূরে ;
বধির যারা দেয় বাহবা
একটি দুটি পয়সা ছুঁড়ে।

বিবসনা বসুন্ধরা
সপ্তঋষির অন্ন জুড়ায়
গন্ধে বাতাস শিউরে ওঠে
আলোর দেশে ঝড় বয়ে যায়

অনেক দূরে অরুন্ধতীর
ওষ্ঠ জ্বলে চোরের চুমায়
আর সমস্ত আকাশ জুড়ে
যুধিষ্ঠিরের কুকুর ঘুমায় ॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

রক্ত, রক্ত

বই ছেঁড়া খাতা ছাতা চটির একপাটি একাকার
রক্ত, রক্ত রাস্তায় মেঝেয় ছাদে দেয়ালে কার্নিশে
মনে স্মৃতির অলিন্দে রক্ত...এঘর-ওঘর ঘুরে
ঘৃণায় পৈঠায় নেমে নেমে ক্রোধের বমন সেরে
রক্তমাখা ভালোবাসা এখন রাস্তায়···রক্ত কেন
সময় স্মরণ স্বপ্ন সমস্ত পথের প্রান্তে পথে
চাপ-চাপ এত রক্ত কেন রক্ত এত রক্ত কেন
তৈমুর তাতার হুণ আগ্রাসী ইংরেজ—কারা ওরা
সাঁজোয়া হেল্‌মেটে কিংবা দপ্তরে বা সেক্রেটারিএটে
অহিংসা শৃঙ্খলা শান্তি স্বার্থের অসংখ্য প্রতিশব্দ
লাঠি-গুলি-গ্যাসে লিখল ওরা কোন্ দেশের মানুষ
শোনো বঙ্গজন শোনো, ভীত দ্বিধান্বিত ফিরে দ্যাখো
ক্রোধই ভ্রূভঙ্গি যার ঘৃণা-আকুঞ্চন যার ঠোঁট
দ্যাখো, সেই রক্তমাখা ভালোবাসা এখন রাস্তায়।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এশিয়া

এখন অস্ফুট আলো।   ফিকে-ফিকে ছায়া-অন্ধকারে
অরণ্য, সমুদ্র, হ্রদ, রাত্রির শিশিরসিক্ত মাঠ
অস্থির আগ্রহে কাঁপে, আসে দিন, কঠিন কপাট
ভেঙে পড়ে।   দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো
দীর্ঘ রাত্রি মরে যায়, ধ্বসে যায় জীর্ণ রাজ্যপাট :
নির্ভয় জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে।
হে এশিয়া, রাত্রি শেষ, 'ভস্ম-অপমান-শয্যা' ছাড়ো,
উজ্জীবিত হও রূঢ় অসঙ্কোচ রৌদ্রের প্রহারে।

শহরে বন্দরে গঞ্জে, গ্রামাঞ্চলে, খেতে ও খামারে
জাগে প্রাণ, দ্বীপে দ্বীপে মুঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায় ;
অগণ্য মানবশিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক
দুর্জয় আশ্বাসে শোনে, দৃঢ়পায়ে হাঁটে।   তারপরে
ভারতে, সিংহলে, ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়
বীতনিদ্র জনস্রোত বিদ্যুৎ-উল্লাসে নেয় বাঁক।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

সে, বৃক্ষ এবং আমি

জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালাম
দেখি জানলার ওপারে প্রত্যক্ষ সে
মহীরূহের মতো দাঁড়িয়ে আছে।
তখন দেয়ালঘড়িতে মধ্যরাত এবং
আকাশের চূড়ায় জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ।
আমার দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসাগুলির উপর তার হাত
প্রশাখার মতো ছড়ানো, পৃথিবীর শিকড়ে
এমন কোনো মধু বা ধাতু নেই
যা তার অনায়ত্ত; আমার বাগানের মাথায়
দুর্গাপ্রতিমা আকাশ, নক্ষত্রের পট জরিমোড়া,
নিচে ঝিঁঝিপোকার জঙ্গলে বৃক্ষের নাম ধারণ করে
সে দাঁড়িয়ে, যেন আমিই।

শেষরাতে বাগান থেকে দারুভূত আমি
জানলার ভিতরে তাকালাম,
দেখি ঘরের মধ্যে সে শুয়ে আছে
স্পষ্ট, যদিও তখন কুয়াশায় চরাচর আচ্ছন্ন
এবং পৃথিবীর রহস্যগুলি সর্বত্র সজীব; শুধু
মমতাময়ী সিঁড়ি উঠে গেছে চিলেকোঠায়
এবং একটি বন-জোনাকি নক্ষত্র ফুটিয়েছে শিয়রে,
ঘরের মধ্যে মিথুনরাশির মতো জোড়া খাট, মেঝেয়
আকাঙ্ক্ষার সলতে উসকানো, এবং সে, মহীরূহ,
আমার নাম ধারণ করে সেখানে বসবাস করছে,
যেন আমিই।

অরুণ ভট্টাচার্য

সমর্পিত শৈশবে

হাওয়া বইছে চতুর্দিকে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে
বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
পাহাড় নিষ্ঠুর বড়। বার বাঁর সে নামছে উঠছে,
জংলী গাছ কাঁটালতা কতগুলো শিলাখণ্ড তাকে
হৃদয়ে টানছে। শুষ্ক টিলার ওপর
বসে পড়ে কখনো বা উদ্‌ভ্রান্তের মত
ধূমল আকাশের পানে বারেক চাইছে।

বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
নিম্নে সম্প্রতি সে দেখেছে মাতাল কিছু পুরুষের দল
এ ওর মুখের পরে থুথু ফেলছে কিম্বা
নির্বিচারে গলা টিপছে।
অথচ একদিন তার ভাবনা ছিল
কি করে তিনটি হাঁস বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে জলে
কি করে মেঘের পাড়ে বোনা হয় রুপোলি আঁচল।

বালকটি উঠতে চাচ্ছে পাহাড়-চূড়ায়।
পাহাড়-চূড়ায় সব স্বপ্নগুলি অক্ষত থাকবে বলে
হয়ত পারবে সে তার শৈশবকে ধরে রাখতে দু-চার সেকেণ্ড
নিম্নে এই ভয়াবহ মানুষের শব
দেখতে দেখতে দেখতে তার উজ্জ্বল শৈশবে
ফিরতে পারবে ভেবে এক অপার ইচ্ছায়
গাঢ়বর্ণ পাহাড়টাকে বারবার জড়িয়ে ধরছে।

রাম বসু

যখন যন্ত্রণা

যখন যন্ত্রণা গলা টেপে তীক্ষ্ণ কর্কশ ভাঙা গলার
চিৎকার আকাশ ছিঁড়ে ঊর্ধ্বমুখ, দুর্বিনীত পাখসাটে
তারা খসে, নদী বুক চাপড়ায়, জলস্তম্ভ ফেনার
ক্রুর বাড়বানলে প্রহেলিকা রাত্রির মুখ—রাত্রি কাটে
মৃত্যুর অরাজক ঘূর্ণি ডাকে, নখে নখে উপড়ে আনা
হৃদপিণ্ড অন্ধকারে আলেয়া, স্তরে স্তরে মাটি খসিয়ে
পদ্মনাগের উদ্যত ছোবল, ব্যূহ অরণ্যে রাতকানা
পাখীর অন্তিমকান্না, পাঁজরে পাঁজরে ছুরি বসিয়ে
ঘাতকের অট্টহাসি, হৃদয়ে রুদ্ধ চাপা চাপা গোঙানী
ক্ষিপ্ত সিংহ যেন দেশটাকে দাঁতে করে ঘাড় ঝাড়া দেয়
হাড়মাস চিবিয়ে চিবিয়ে তার অরণ্য কাঁপা শাসানি
বিদ্যুৎ কৃপাণ হাতে কাপালিক মেঘ পাহাড় চূড়ায়
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেন ভয়ে ডাক ছেড়ে মাথা আছড়ায়,
তখন কই সেই মানুষের প্রকাশ—কোথায় কোথায় ?

অমিতাভ চৌধুরী

ছড়ার কলকাতা

সি এম ডি এ গর্ত খোঁড়ে, দ্যাখ দ্যাখ।

•

বেকার আছে রামাশ্যামা, বেকার আছি মুই।

নেতাদের রোজ লম্বা ভাষণ,—"আসছে শুভ দিন।"

ট্রামে বাসে ভীষণ ভিড়, ট্যাক্সি পাওয়া ভার।

পাতাল রেলের কাজ চলছে, কাটা পড়ছে গাছ।

দিন তুপুরে রাহাজানি, চোর ডাকাতের ভয়।

ধর্ম নিয়ে মারামারি, রয়েছে জাতপাত।

রেশনে চাল গন্ধ পচা, পকেট গড়ের মাঠ

কালো বাজার চোরাবাজার ভেজালদারের জয়

তেমনি আলো তেমনি হাওয়া, ভালবাসায় বশ।

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

বাঘের পিঠে

বাঘের পিঠে বসিয়ে বেশ কেটে পড়েছ,
এখন থামা কঠিন
নামাও বিপদ।

বয়েস ঢেল হল,
রোদের তাপ কমে আসতে সবুজ চসমাটা আপ্সে পকেটে ঢুকেছে,
মাঠ মাটি নদী আকাশ এবং নারী
এখন আসলে যা তা-ই।

এককালে বুকের হাত খানেক জায়গায়
সেই যোজন জোড়া সমুদ্র
দোতলা সমান ঢেউ তুলে ফুঁসে উঠত,
হেজে মজে এখন সেটাও একটা বালিয়াড়ি।

ভেবেছিলাম এবারে সবদিক থেকে মুক্ত
বোকাসোকা পেয়ে কেউ আর
এই মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে আসবে না।

হায়, তখন কি জানতাম
সব গেলেও কৌপীনটা থেকে যায়,
আর তুমি সেই সুযোগটা নিয়েই
একেবারে বাঘের পিঠে বসিয়ে দেবে!

বৃত্ত সম্পূর্ণ করে এবার কি তাহলে ল্যাংটো হবো?

কৃষ্ণ ধর

আমরা আসছি

আমরা স্টিভ বিকোর শব বয়ে নিয়ে চলেছি
বান্টুপাড়ার অশ্রুভেজা ধুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে।
আমাদের প্রিয়তম স্বপ্ন, আমাদের ভালবাসা আমাদের সর্বস্ব
তার পিছু পিছু চলেছে নীরবে মাথা নিচু করে।
স্টিভ বিকো আর কথা বলবে না
তার সব কথা এখন আমাদের বুকের ভিতর
প্রেইরির দাবানলের মতো জ্বলছে।
স্টিভ বিকো আমাদের প্রিয়তম বন্ধু, আমাদের সাথী
যাচ্ছে আমাদের কাঁধে চড়ে
বান্টুদের বসতি পাহাড়তলির মাটিতে
ঘুমোবার জন্য।
আমাদের ভালবাসত বলে স্টিভ বিকোকে ওরা মেরেছে
আমাদের বাঁচাতে চেয়েছিল বলে স্টিভ বিকোকে ওরা বাঁচতে দেয় নি।
স্টিভ বিকো আমাদের প্রিয়তম বন্ধু। আমাদের সহযোদ্ধা
যাচ্ছে এখন আমাদের কাঁধে চড়ে
বান্টুদের বাপপিতামহর পাশে ঘুমোবার জন্য।

আজ নয় কাল
আমরা তার কবরের মাটি মুঠোতে ধরে ফিরে আসছি
সেই জেলখানার দরজায়
আমরা ফিরে আসছি দল বেঁধে
স্টিভ বিকোর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার জন্য।

সিদ্ধেশ্বর সেন

নিষ্ঠুরতা ঘটে গেছে

নিষ্ঠুরতা ঘটে গেছে, রেখোনা রেখোনা রক্তক্ষার
শিরা-উপশিরা ফেটে শোণিতক্ষরণ শতধারে
উদ্ভিদ, মাংসলপেশী, কাণ্ড-জটা-গুল্ম, হিমঝাড়
সহস্র উদ্যতমূল শাখাপ্রশাখার সংজ্ঞা কাড়ে
বনভূমি প্রাণভূমি সর্বনাম ভূমিজ-জাতক
উত্থিত ক্ষেত্রজ বেঁধে হল মুখে, মেদিনীও নড়ে
জননী জনক-বা কে, দেখি তার নিজের আড়ালে
ছিন্নগর্ভা ধরিত্রীর সর্বংসহা স্নেহই খাতক
যদি না নির্মোহ টানে আত্মজকে পুনর্গর্ভে ধ'রে
সময় প্রযুক্তি ঢাকা নশ্বর গহ্বর ঊর্ণাজালে

আগমন-নিষ্ক্রমণ, উদ্যোগ-প্রস্থান সংস্থাপক
গর্ভাঙ্ক-ঘুরন্ত, দৃশ্য, আমি তার মধ্যে স্থানে কালে
স্থাপিত হয়েছি, দেখি, অন্তিম যজ্ঞের নিয়ামক
অগ্নি শুধু অগ্নি তার ভীষণ জ্বলন্ত-সাক্ষ্য জ্বালে ॥

অরবিন্দ গুহ

হত্যাকারী

একজন সার্থক হত্যাকারীর সঙ্গে
নির্জনে দেখা করার বড়ো সাধ হয়।
বিশাল, বিশাল পাহাড়ের পথে
এক ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধতায়
যেন তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়।
যাকে হত্যা করেছিল
তার চেয়েও করুণ, ছিন্নভিন্ন, সর্বস্বান্ত
শরীর—
এই হত্যাকারী।
অথচ
কোনো পুলিশের বড়োকর্তা তাকে
স্পর্শ করতে পারে নি ;
কোনো আদালতে তার
বিচার হয় নি।
পাহাড়ের উদ্দাম অরণ্যে
দ্বিপ্রহরের আকাশের তলায়
রাত্রির মতো আচ্ছাদিত মুহূর্তে
তাকে আমি দু-হাত ধরে প্রশ্ন করতাম
তাই, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে
সেই নিহত মানুষটি
শেষ নিশ্বাসেব ভাষায়
কাকে অভিশাপ দিয়েছিল—
তোমাকে, না, ঈশ্বরকে ?

সুনীলকুমার নন্দী

বিষ

জলের কোথায় দোষ, কোথায় জলের স্বেচ্ছাচার

স্বাভাবিক নিয়মে নেমেছে জল
ঢালে-ঢালে, প্রসারিত হতে চায় সমুদ্র-বিস্তারে
কথা ছিলো
সুগঠিত বাঁধে-বাঁধে শিবের জটায়
বেঁধে জল, জলস্রোত নিয়ে যাবো
নদীর গভীর বেয়ে, খালে-খালে বহতা ধারায়
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মাটির তৃষ্ণায়
মাঠে
খরার ফাটলে : কথা কে রেখেছে ?
কেউ তো রাখেনি ভুল, ঘুণঘোর
আমাদের যা-কিছু নির্মাণে, কথা
না-রেখে, এখন বলছি
জলে দোষ

জলের প্রবল চাপে
ব্যারেজের নাট-বল্টু খুলে যাচ্ছে, আহত বাসুকি
ছোটে, ছুটে চলে
আবর্তে ফেনিল, জল
ইতিমধ্যে বিষ

কোথায় রয়েছে দোষ, কার অবহেলা গূঢ়, কার স্বেচ্ছাচার !

সুনীল বসু

অসম্ভব দুজন

মুখোশ-পরা লোকটা এলো মুখোশ-পরা লোকটার কাছে
দুজনে হাত ঝাঁকানি দিয়ে খুব কষে করমর্দন করলো
একজন মুখোশ-পরা লোক
হাসলো হা হা হা হা হা হা করে
আর একজন মুখোশ-পরা লোক
হাসলো হো হো হো হো হো হো করে
আর
দুজনেই ওরা দুজনকে বললো
'সাবাস সাবাস'
'সাধু সাধু'
তারপর দুজনেই ওরা চলে গেল দুদিকে
অনেক দূরে
সেখানে ওরা দুজনেই দুজনের মুখোশ খুললো
আর দাঁত কিড়মিড় করে
দাঁত কিড়মিড় করে বললো
'নচ্ছার'
'নচ্ছার'

কেদার ভাদুড়ী

অদ্ভুত সমাজ এই

অদ্ভুত সমাজ এই সমাজের নিয়ম-কানুন
কত বড় বিসি হ'লে বাছাধন গণতন্ত্র চায়
ক'রে খাও বাপধন, ক'রে খাও, কে মানা ক'রেছে
লুটে খাও পুটে খাও যে-যুগের যেমন নিয়ম

অদ্ভুত সমাজ এই সমাজের নিয়ম-কানুন
নেহাত যে বেঁচে আছো, তোর ভাগ্য, তুই ঘরে তোল
কেউ দেখবার নেই, কেউ শুনবার নেই, কেউ
রাস্তা জুড়ে মুতে চল, ছিঁড়ে রাখ প্যাণ্টের বোতাম

মিনিটে মিনিটে দাম বেড়ে চলে জিনিসপত্রের
অপগণ্ড কবিগণ তবু দ্যাখে আকাশ রঙীন
ঘুষখোর সভ্যতার মুখে থুতু দিতেও জানিসনে
মনে হয় ব'লে ফেলি, হে ইংরেজ, তুই ফিরে আয়

এসব রাগের কথা, বড় দুঃখে অর্ধেক সেলাম
সারা দেশ মাগী হ'লে আমি তবে গডসে হ'য়ে যাব
গুলি করবি ? ফাঁসি দিবি ? আয় শালা গুলি ক'রে দ্যাখ
রক্তবীজ ! রক্তবীজ ! ওরে শালা রক্তবীজ আমি···

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

অবাধ্য বালক

কী করছে ওখানে বসে মলয়
বা মলয়ের মর্মর-ফলক ?
রোদ খাচ্ছে শীতে ?
নাকি তার রেখাশূন্য শাদা হাত
আমাদের বোঝাচ্ছে ইঙ্গিতে :
আয়ু যশ ভাগ্য ব'লে কিছু নেই
আছে ক্রোধ
উজ্জ্বল নির্বোধ,
আর আছে প্রতিহিংসা
দমিত রক্তের জন্য দমিত রক্তের তৃষ্ণা ।
বলছে : ওহে ভদ্রলোক
প্রতিদিন ক্ষৌরী হও
প্রতিদিন উখো দিয়ে নখ
করেছ মসৃণ, করো, উল্‌টোনো বঁটির মতো
থাকো কাৎ হয়ে,
বৃদ্ধ জরাগ্রস্তদের মধ্যে আমি অবাধ্য বালক
চন্দ্রবিন্দু নিয়ে খেলা করি ।
উনিশশো পঞ্চাশে জন্মে উনিশশো সত্তরে
তোমাদের ঘৃণা করে মরি ।

শঙ্খ ঘোষ
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো ?
চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব ?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান ক'রে ধূপ জ্বেলে চুপ ক'রে নীল কুঠুরিতে
বসে থাকি ?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে প'রে নিই
মানবশরীর একবার ?

দ্রাবিত সময় ঘরে বয়ে আনে জলীয়তা, তার
ভেসে ওঠা ভেলা জুড়ে অনন্তশয়ন ভালো লাগে ?

যদি তাই লাগে তবে ফিরে এসো। চতুরতা, যাও।
কী বা আসে যায়—

লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয় !

আলোক সরকার

আড়চোখে

শসাগাছের ডালপালায় সবকটিই পুরুষফুল আনন্দে নৃত্য করছে
কামড়াচ্ছে এ-ওকে-তাকে কখনো গলাগলি কখনো স্থিরপ্রাজ্ঞ বকধার্মিক।
এইসব চিত্রাবলী জাগায় আমার কৌতুক। পরিষ্কার দুপুর বেলায়
শব্দ শুনে ফিরে চাই দ্রুত ভিড়ের হুড়োহুড়ি ঝুড়ি মাথায় আলুওলা—
বকুলগাছের ডালে কাক বসার আগেই জ্বালাই অলস সিগারেট।
শসাগাছের ডালপালায় সবকটিই পুরুষফুল, আমার বাগানের
শেষদিকের নিমগাছে স্থবির ধূসর পেঁচা—এই নিয়ে কতোবার
অন্ধকার রাত্রি হলো লাফিয়ে উঠলো ইঁদুর অন্ধকার রাত্রি হলো।

প্রতিপক্ষহীনতার যন্ত্রণা এটাই আসল বিষাদ। আমার শসাগাছে
বারংবার পুরুষফুল লাফায় ঝাঁপায় শূন্যে ঘোরায় তলোয়ার।
আর অনন্ত নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে তোলে মধ্যাহ্ন মরুশীতল নিশীথিনী।
মশাল জ্বালা মিছিল সঙ্ঘবদ্ধ জনতা গলির পাশের প্রস্তুতি
সম্ভাবনাহীন চীৎকারে গেঁজিয়ে-ওঠা ধুলো এঁটো বাদামের খোসা।
যথার্থ বিরুদ্ধতা তার নামই তো জীবন মাটি এবং বীজ—
আমার শসাগাছে সবকটিই পুরুষফুল আবহমান পুরুষফুল
কামড়াচ্ছে এ-ওকে-তাকে—অর্থহীন পণ্ডশ্রম আড়চোখে
দেখছে কেউ কেউ।

পূর্ণেন্দু পত্রী

ডাকো

অবেলায় রক্ত ঝরেছিল। এখন ললাটময় সেই রক্তে চন্দনের টিপ্।
এখন আবার গাছে ফুল, ফুলে গন্ধ
গন্ধে চেতনার আভা ফিরে আসে।
আবার আকাশমুখী শিখা তুলে দীর্ঘ হয় মানুষ ও মাটির প্রদীপ
যদিও এখনো বহু পরিচিত ভালবাসা শুয়ে আছে হিমে, ভিজে ঘাসে

এই তো সময় ; ডাকো। পাল তুলি। পা ফেলি পার্বণে।
হাসির হো-হো-র মত জলে স্থলে করতলে
একাকার মিলি ও মেলাই।
মহাকাল দূরে বসে পুরনো বানান কেটেকুটে
লিখে যাক আপনার মনে
ইতিহাসে ছাপা হলে আমরাই হবো তার কেন্দ্র জুড়ে সবুজ সেলাই।

কবিতা সিংহ

যাক ভিখারিণী

তোমার নিকট থেকে বাঁচাও তোমাকে নারী
ভয়
ভয় বড় ভিতরের ভিখারিণীকে
তীব্র বেনারসী আর হীরার গহনা যার
দীনভাব ঘোচাতে পারে না !
দিন শুরু থেকে যার চাওয়া শুরু লোভ
ভরা পেটে লোভ যার লোকমান্যে লোভ
তোষামোদে
অনৃত-ভাষণে তাকে ভয় !
ভয় তাকে, যে বসেছে লোহার অলক্ষ্মী হয়ে
মান সিংহাসনে
ভয় তাকে যে রেখেছে
অমৃতে নিহিত গূঢ়বিষ
ভয় তাকে যে রেখেছে প্রেমের ভিতরে ছোট
সন্দেহের কাঁটা !

সেই-ই যাক
যাক সেই বিজয়িনী ভিখারিণী চলে যাক তার
স্তূপাকার এঁটোকাঁটা ভিক্ষাপাত্র হীন জয় নিয়ে
সেই যাক

যে হয়েছে আনন্দ-ভিখারী
যে হয়েছে মানুষের পদরজে চন্দন-মথনা।

সলিল লাহিড়ী

নতজানু কেন

বাঁচবার সাধ যদি,
হাঁটু ভেঙ্গে নতজানু হয়ে বাঁচা কেন ?
করপুট জোড় করে কত আর নীচু হবে ?
এখনও সময় আছে,
কলুষ বাতাস ছিনে টেনে নাও নবীন নিঃশ্বাস ;
আকাশের বুক ছুঁয়ে দৃঢ় হোক্ শরীর তোমার
ভেঙ্গে ফেল ভয়ের মুখোস,
হৃদয় সমুদ্র হোক্ উন্মাদ গর্জনে।
বাঁচতেই সাধ যদি,—
আর নতজানু নয়।
হয়ে ওঠো দুরন্ত সাইক্লোন।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

অশুভ সঙ্গীত

প্রত্যহ ভোরেই শুনি,
ভিখিরিরা গান গায় করুণ গলায়। যাত্রানাস্তি,
মনে মনে অশুভ-সঙ্কেতে কেঁপে উঠি।
অসহ্য ভিখিরিগুলো পাঁজিপুথি কিছুই মানে না।
বাজারে মহার্ঘ সবই—
চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি।

ফিরে আসি ঘুরপথে বাজারের শূন্য থলি হাতে
কয়েকটি বেকার ছেলে বলে গেল, কেউ তো জানে না,
আপনাকে জানাচ্ছি দাদা,
অবশ্য আসবেন কিন্তু মন্টুর বাড়িতে আজ রাতে,
শোনা যাবে লক্ষ্ণৌ ঘরানা।

ভয় হয়
আবার পেট্রল, মদ্য, মেয়েদেরও
অতর্কিতে
আরো কিছু দাম বেড়ে যাবে।

আনন্দ বাগচী

আজকাল

বুড়ো আঙুলের এক টুসকিতে পিঠ উল্টে কলকাতা শহর
রূপোর টাকার মত শূন্য ছুঁয়ে ফিরে এল হাতে,
দৃশ্যপট ফ্রেমে সাঁটা খোল নলচে বদলে গেল :
আকাশ মানুষ রাস্তা ছন্দটন্দ নিতান্তই তিরিশ বছরে
অন্যরকম হয়ে গেল যেন ঘুর্ণি মঞ্চের কাহিনী
নীলামে চড়েছে কুশীলব সুদ্ধু, আচমকা খড়ির গণ্ডি মুছে
শহর-শহরতলি একমূর্তি, অফিসের এবেলা-ওবেলা
তুবড়ির খোলের মধ্যে বিস্ফোরক লোহাচুর ঠাসে,
জ্যামের কৌটোর মত ট্র্যাফিক চৌমাথা
উপচে পড়া মানুষের ডাস্টবিন—ট্রাম বাস ট্রেন
চলন্ত জুতোর ডগা ছুঁয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গোড়ালি।
কথা কাটাকাটি করে দ্রুতশ্চল দেওয়াল-লিখন,
লম্ফমান হৃৎপিণ্ডে কান পাতে স্টেথোর বদলে
বন্দুকের নল, অন্ধকারে বোমা ফাটে
তবু নির্বিকার মুখ মানুষের সংবিধান বুকে
আখ মাড়াইয়ের কলে দেখা হবে, দেখা হবে কসাইখানায়
ব্রীফ্‌কেস অ্যাটাচি টাই স্ট্র্যাপ ছেঁড়া স্যাণ্ডেল বগলে
ধড়হীন মুণ্ডু যায়, ফিরে আছে মুণ্ডুহীন ধড় !

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঈশ্বরের প্রতি

যেদিকে ফেরাও উট, যত দূরে-দূরে তুমি কীর্ণ করো তাঁবু,
মানুষের বুকের পালক নিয়ে হরেক রকম পাখি তোমার আকাশে
ওড়াও যতই, কিংবা এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গিয়ে
পরীদের খাদ্যের সংস্থান করো, প্রসন্ন হবার মন্ত্র জানো ;

যেদিকে ফেরাও তব অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিবিধ কৌশল ;
যদি প'ড়ে থাকি নিষ্কাশিত-আশাখড়, ব্যাপ্ত বালির শয্যায় ;
যতই রাঙাও একচক্ষু সূর্য একচক্ষু চাঁদ,
নিয়তির নীলাকাশে কৃষ্ণপতাকার রাত্রি উত্তোলন করো ;

যে-ধারেই ফেলে রাখো আমার শরীর—পূবে, পশ্চিমে, শ্মশানে ;
কেটে দিতে চাও উল্কি ডান হাতে, জোর ক'রে দীক্ষা দিতে চাও—
অথবা উচিত শিক্ষা দেবে ব'লে পাপী করো পরিতাপী করো ;
প্রেমিকার স্বাভাবিক গভীরতা নষ্ট করতে ব্রতী হও ;

মানুষের ঘরণীকে মধ্যরাতে টেনে নিয়ে তোমার মন্দিরে
যতই লেখাও আরো থেরীগাথা, সিঁথি 'পরে কারো অবৈধতা,
যেদিকে ফেরাও উট, এই দ্যাখো করপুটে একটি গণ্ডুষ
বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো, আমি জল না খেয়ে মরবো ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্তিত

নিরস্ত্রের যুদ্ধে যাই   শস্ত্র হয় মন।
অন্ধকার পিতার চোখ, আকন্দের আঠা
চুঁইয়ে পড়ে মায়ের গালে, ধাতুর দর্পণ
আমাকে করো ঘাতক, বেঁধো তীক্ষ্নধার কাঁটা
চক্ষে আর জিহ্বা কাটো অক্রূরের বাণে
আমাকে দাও হত্যা করি আমার সন্তানে।

মন আমার অস্ত্র হয় অন্ধকার বাধা
তার কঠিন হৃদয়ে মারি ঘুম ভাঙার ঘা
অঙ্গ আমার অবশ হলো কঠিন হলো কাঁদা
অন্ধকার বললো জেগে, এবার ফিরে যা।
অজগরের মাথায় জ্বলে মণির মতো ভোর,
ক্লান্ত বীর এবার ফের ফেরার ঘরে তোর
মা হয়েছেন ফটিক জল, পিতা জোনাক পোকা,
ভিটের ভাঙা ধুলোয় কাঁদে ছাতার পাখি একা

অন্ধকার তারার চোখ আকাশ পোড়া সরা
ভাগ্য কালো কাকের গা, ক্ষুধার অন্ন জরা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যবনিকা সরে যায়

যবনিকা সরে যায়, দেখি দূর অন্ধকারে স্মৃতির ওপারে
শতশত বন্দীশালা, ভরে আছে ঝুল কালি ধোঁয়া
অথবা পূজোর ঘন্টা, অথবা মদির লাস্য গীত
এ এমন কারাগার, যেখানে প্রহরীবৃন্দ বড় বেশি পরিহাস প্রিয়
শব্দের আহ্লাদে তারা লোহার বদলে আনে সোনার শৃঙ্খল।

যবনিকা সরে যায়, দেখি এক অসত্য সমাজে
অলীক কুনাট্য রঙ্গে রাঢ় বঙ্গ বুঁদ হয়ে আছে
উচ্ছিষ্ট ভোজীরা মেতে আছে লোভী প্রতিযোগিতায়
বিজ্ঞ ও ভাঁড়েরা যেন ব্যগ্র হয়ে করে নেয় ভূমিকা বদল।

যবনিকা সরে যায়, দেখি সব দৃশ্যকে পেরিয়ে অন্য আলো
ভয় ভেঙে, কান্না ভেঙে বিপন্নেরা বেরিয়ে এসেছে রাজপথে
রক্ত লোলুপের ঝাড় থেকে উঠে এলো কোনো প্রকৃত মহান রক্তদাতা
সপ্তরথী ঘেরা তবু ঘোর যুদ্ধে মেতে আছে খর্বকায় একাকী ব্রাহ্মণ
এক একটি দেয়াল ভাঙে, হুহু করে আসে সুবাতাস
কিছু গ্লানি মুছে ফেলে ঊনবিংশ শতাব্দীটি পাশ ফিরে শোয়।

জয়ৎ সেন

কাগ

অথচ এ-দেশে স্থলে স্থলপদ্ম ছিলো
অথচ এ-দেশে জলে জলপদ্ম ছিলো
অথচ এ-দেশে শূন্যের অনন্ত সত্য
পদ্মযোনি ব্রহ্ম বসেছিলো
সংস্কৃত ভাষায়

নগরে কি বেলা পড়ে যায় ?
গ্রামে ?
অন্ধকার থিতু হয় ক্রমশই দানা বাঁধে উচ্চস্বরগ্রামে
মুদ্রার রাক্ষস।
পাহাড়তলিতে নামে ধস।
মস মস জুতো হাঁটে, চক্রযান ধোঁয়া ছাড়ে, পেট্রলের ঘাম
জড়ায়ে তন্তুজ শিল্প, অমানিশা, ঘোর মধ্যযাম
লাগ ভেলকি তুক
না লাগে তো লাল টুকটুক
আপেল উড়িয়ে বলি, কোথা যাও স্রাব ?

দুষ্ট ক্ষত, বিসূচিকা, ধোকড়, সরাব
চেয়েছো আহ্লাদ কিছু, চাওনি ইতমাদ।
মানুষের মোমছালে মানুষের মাংস খসে, এই সংবাদ
যতই প্রচার করি তত হয় রাগ
আমি মরি পিত্তশূলে তুমি মরো কাগ

কৃষ্ণপক্ষ কৃষ্ণ চঞ্চু কৃষ্ণকালো নখ
এক অর্থে বন্ধু তুই, অন্য অর্থে বিশ্বাসঘাতক

সাধনা মুখোপাধ্যায়

বিপ্লব জিন্দাবাদ

সুখের বদ্ধ জলাশয়ে স্বস্তির মাছ হয়ে
সকলেই বাঁচতে চায় না
অনেক কিশোর আছে তৃপ্তির তৃণভূমি ছেড়ে
ছুটে যায় সে অরণ্যে যেখানে শ্বাপদ আর
হিংস্র হায়না

বিশ্বস্ত থালায় ভাত অভ্যস্ত পালঙে ঘুম
সকলেরই ধাতেতে সয় না
সকলেই হৃষ্ট নয়
সুখের খাঁচার কোণ হতে পেরে পুষ্ট ময়না
বারবার ইচ্ছে করে খাঁচা ভেঙে উড়ে যেতে
বারবার ইচ্ছে করে সন্তুষ্ট জাহাজ ছেড়ে
জেলে-ডিঙি নৌকায় চড়ে
নিতে রুষ্ট সমুদ্রের স্বাদ

তাইতো আসৃষ্টিব্যাপী
হৃদয়ের অশরীরী ধমনীর ইচ্ছেরা অগাধ
চিরকাল চিরদিন মিছিল সাজাবে
আর ভেঙে দৃঢ় শাসনের বাঁধ
বলে যাবে বিপ্লব জিন্দাবাদ···বাদ

বিনয় মজুমদার

একটি কবিতা

শিশুকালে শুনেছি যে কতিপয় পতঙ্গশিকারী ফুল আছে।
অথচ তাদের আমি এত অনুসন্ধানেও এখনো দেখিনি।
তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি,
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট নষ্ট খোসা, শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, ছাখ, কী মলিনবর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল।
আলোকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে
অথচ পায়রা ছাড়া অন্যকোনো ওড়ার ক্ষমতাবতী পাখী
বর্তমান যুগে আর মানুষের নিকটে আসে না।
সপ্রতিভভাবে এসে দানা খেয়ে ফের উড়ে যায়,
তবুও সফল জ্যোৎস্না চিরকাল মানুষের প্রেরণাস্বরূপ।

বিশেষ অবস্থামতো বিভিন্ন বায়ুর মধ্যদিয়ে
আমরা সতত চলি ; বিষাক্ত, সুগন্ধি কিংবা হিম
বায়ু তবু শুধুমাত্র আবহমণ্ডল হয়ে থাকে।
জীবনধারণ করা সমীরবিলাসী হওয়া নয়।
অতএব হে ধিক্কার, বৈদ্যুতিক আক্ষেপ ভোল তো,
অতি অল্প পুস্তকেই ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ত্যাগ

সঙ্গ যে ছেড়েছে তার প্রসঙ্গ থাকুক, শেষ বসন্তের
এই নির্লোভ হাওয়ায় এসো আমরা অন্য কথা বলি।
পায়ের নিচেই পড়ে আছে আমাদের
ছেঁড়া খোঁড়া ছাল-ছাড়ানো কলকাতা, ছোট বোঁচা অন্ধ গন্ধগলি
এর মধ্যেই নারীর সর্বনাশী শরীরে এখনো
খলখল বসন্ত এসে কলরব করে.
ব্যর্থ বোকা রাজনীতির রৌরব ডুবিয়ে বারংবার
শোনা যায় নাবালক ক্ষুধার ধিক্কার!
আমাদের কালি দিয়ে লেখা পাতার ওপরে
এখনো যে কটি শব্দ একা একা নড়ে
আজ তাদেরই বলছি—সঙ্গ যে ছেড়েছে তাকে
একাকী মেলাতে দাও দিগন্তরেখায়, ঐ ভরাশোচনা
ধু ধু ধুলোয় সে তাকিয়ে দেখুক নিজে
মানুষের জন্য কিছু করেনি বলেই নিচে
তার কোনো পদচিহ্ন ফুটে উঠছে না।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

স্বদেশ

টুটি ছিঁড়ে কিছু রক্ত ঢেলেছি করবীর মূলে—

ভুল হয়েছিল ?

ছুটে চলে গেছি পাহাড়তলির নীল ইসকুলে—

ভুল হয়েছিল ?

মেঘ একটানে কালো টুপি খুলে হঠাৎ যেখানে

অবাধ ঝর্ণা,

ধর্মঘটের মত বোল্ডারে আছাড়িপিছাড়ি

খ্যাপাটে জোয়ার,

স্যাংচুয়ারির সবুজ গহনে হাতির খেদায়

অনিদ্র রাত,

এ-মুড়ো ও-মুড়ো উত্তর থেকে দক্ষিণে ফেরা—

ভুল হয়েছিল ?

ভিখারী বালক স্বপ্নে পেয়েছে একথালা জুঁই,

তাড়িত স্বপ্নে

মায়ের বুকের দুধের মতন ফিনিকে ফিনিকে

ধানের বন্যা,

তিনখানা ইঁটে পাতা উনুনের আঁচে ফুটপাতে

গাঁওছুট বুড়ি

স্বপ্নে দেখছে দেশের ভিটেয় লোক-ঝমঝম

ভরা সংসার,

শহুরে রক্ত কারবাইডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত

হা রে যৌবন,

এইসব মিলিয়ে আমার স্বদেশ, আমার

রক্ত মাংস

ভালোবেসে বেসে চোখ চলে যায়—ভালোবাসা

সে কি ভুল হয়েছিল ?

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সুদিনের জন্য

সুদিনের জন্যে ওরা
বুক বেঁধে অপেক্ষায় থাকে
সুদিন আসে না।

কার্তিকে, একটু একটু ক'রে হিম জমে ঘাসে।
মরা পাখি প'ড়ে থাকে, মাঠের ওপরে।
গম্‌গম্‌ শব্দ ক'রে ট্রেন চ'লে যায়।

ওরা হয়তো পাল্‌টে দিতে চায় পৃথিবীকে,
কিন্তু কিভাবে পাল্‌টাতে হবে, বুঝতে পারে না।
লেপ-কম্বল মুড়ে, শবের মতন প'ড়ে থাকে।
এইভাবে চলে।

কিন্তু যে-ভালোবাসা অনুভব করলে, তবে
সমস্ত ঝাপ্‌টার মধ্যে স্থির থাকা যায়,
যতটুকু ঘৃণা থাকলে, আগুনের হল্‌কার মতন
মাঝে মাঝে ঝল্‌সে ওঠা যায়,
সেইসব ঘৃণা, ভালোবাসা
ওদের আছে কি ?

সুদিনের জন্যে ওরা অপেক্ষায় থাকে
তবু সুদিন আসে না।

তারাপদ রায়

অপ্রাকৃত কবিতা

'অনেকদিন আমি এই শ্মশানে রয়েছি,
কে আমার পিণ্ড দেবে,
কার পুণ্যে মুক্ত আমি হব অবশেষে?'...হিহি শীতে
নির্মম জ্যোৎস্নায় মেশা কুয়াশায় পৌষের রাত্রিতে
প্রেতের করুণ কণ্ঠ, 'কেউ মুক্তি দেবে?'
মূঢ় শববাহকেরা ব্যাজারে শরীর ঢেকে নিয়ে
নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হলো আগুনের কাছাকাছি ঘেঁষে—
কি দেখবে? 'কি দেখবো, কি জানি?'...ভেবে একবারো মুখ তুলে
তাকালো না। কে তাকাবে প্রেতের নয়নে, কঙ্কালের অক্ষির বর্তুলে!
অসম সাহসী কেহ সেখানে ছিল না।
(ম্লান পরপারে, কাঁটামনসার ঝোপের ভিতরে
ক্ষুধার্ত শিকারী চাঁদ নেমে গেলো খদ্যোতের খোঁজে
চতুর্দিকে মুখরিত শৃগালের আর্ত প্রতিবাদ)
অনাথ প্রার্থনা ক্ষীণ জ্যোৎস্নাহীন আসন্ন আঁধারে:
'চিতাভস্ম, শব গন্ধ বড় দীর্ঘকাল
এই খানে শুষ্কচরে পড়ে আছি বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল।'

করোটিতে কোনো ইচ্ছা, কোনো বাঞ্ছা গলিত হৃদয়ে
নিরাশ করুণ এক প্রেতকণ্ঠ হিমার্দ্র হাওয়ায়,
'মধু বায়ু, মধু সিন্ধু, দিবসরজনী মধুময়
তোমরা কে দেবে বলো, কে তর্পণ করবে আমার?'

বাঁশ, দড়ি, ভাঙা কলসী—শববাহকেরা ফিরে যায়;
পড়ে থাকে বিশাল শ্মশান ভরা শীত, অন্ধকার ॥

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

গান্ধীনগরে এক রাত্রি

গোকুলকে সবাই জানে, চিনে রাখলো ডি.আই.বি'র লোক
স্টেটস্‌ম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘন হলে বলেছিলো, 'আর নয়, এবার ফিরে যা'—
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায়
রিভলভার গর্জে ওঠে গর্জায় গোকুল
রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ঝুঁকে ছিঁড়ে নিলো এক খাবলা চুল
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্রে বেল্টের পিস্তল, বুট,
জলস্রোতে নামে অন্ধকার,
শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ,
পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক।

অধ্যাপক বলেছিলো, 'দ্যাট্‌স র-ঙ্, আইন কেনো তুলে নেবে হাতে?'
মাষ্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব, শুধু মরে গেলো অসংখ্য হাভাতে
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে।'
চটকলের ছকুমিঞা 'এবার প্যাঁদাবো শালা হারামি ও.সি-কে।'

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিঠের তেজী রক্তধারা,
গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিলো তারা।

সামসুল হক

আমার সমাধির উপরে পা দিয়ে

জন্মসমুদ্রের তীর থেকে
পথটা বেরিয়ে এসে
যেখানে দুভাগ হয়ে গেছে
ঠিক সেই তেমাথার মাটির নিচেই
আমার সমাধি

সমুদ্রের দিক থেকে এসে
সমাধির উপরে পা দিয়ে
লোকজন একপথে
বেশ্যালয়ে যায়
সমুদ্রের দিক থেকে এসে
সমাধির উপরে পা দিয়ে
লোকজন অন্যপথে
মাতৃসদনের দিকে যায়

সেই বেশ্যালয়ে
বেশ্যারা গোপন ঘরে
সন্তান লুকোয়
জামার বোতাম ছিঁড়ে দ্রুত দুধ খায়
মাতৃসদনেও
মায়েরা গোপন ঘরে
সন্তান লুকোয়
এক-গামলা ছেঁড়াখোঁড়া লজ্জা ভয় ঘৃণা

বাদল ভট্টাচার্য

বাঁচার সাধ

বিরাট বৈষম্য দেখি নায়কের কথা ও চিন্তায়
কার্য-কারণে নেই নিকট সম্বন্ধ।
শুধু স্তোক বাক্যে ডামাডোলে প্রজ্ঞাপ্রচারণী.
পঞ্চম যোজনা জুড়ে প্রকল্পের রঙীন ফানুস,
হরেকরকমবা...এবং...ইত্যাদি...
ভুখা পেটে মনে হয়
ইত্যাকার যাবতীয় সবই সঠিক—
আরোগ্যের রুচি-হরিতকী।

এবম্বিধ দৃষ্টিভ্রমে
আপাতত সুকল্যাণ স্থিতি,
ভবিষ্যৎ ঘ্রাণে আহা মন মাতোয়ারা...
হা-অন্ন সংসারে ফোটে
পুনরায় কলরব—হাসি।

বিশ্বাসে অটল বুক,
বেঁচে বর্তে যাবে বলে
খাট থেকে উঠে আসে মড়া!

রত্নেশ্বর হাজরা

কোথায়—কোন্‌দিকে

খাড়া পাহাড়ের নীচে ছায়া তার চোখ
প্রায় এক। খাড়া পাহাড়ের
শব্দ থেকে দরজা খোলে। তখন প্রান্তর
৩০০ ঘোড়ার খুরে
কারা যায়!
ঈশানে নৈঋর্তে ছিল ঘর
এখন কোথায়!

রক্তের ভিতরে রাখা মুখ। মুখ তার
লালের উষ্ণতা। রাত্রে হিম
দক্ষিণ পাহাড়ে কেউ জ্বালে
কাঠের আগুন—যেন অগ্নির পাহারা
তাকে রক্ষা করে। তার
বুকের আদিম
রহস্য ছিনিয়ে নিতে কারা
যায়............
ঈশানে নৈঋর্তে ঘর ছেড়ে
এখন কোথায়!

তুলসী মুখোপাধ্যায়

একদিন ছাড়া পেলে

একদিন, মাত্র একদিন ছাড়া পেলে
আমি অচেনা রাস্তা থেকে অচেনা বাড়ি
অচেনা বাড়ি থেকে অচেনা লোককে
তুলে এনে
ওয়াক থুঃ ওয়াক থুঃ
নিমকহারাম বান্দা কোথাকার !

আমি জেলখানার কয়েদীর বকলেস খুলে
পৃথিবী ভোগদখলের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করব
আমি বেশ্যার উরু থেকে দুঃখ চেটে বলব
আর বর-বউ খেলা নয়—
এবার শাস্ত্রমতে বিবাহ তোমার সঙ্গে।

একদিন, হে শেকল, একদিন ছাড়া পাই যদি
আমি ফুটপাতের উলঙ্গ ছেলের পায়ে নতজানু ঃ
প্রভু হে মার্জনা করুন—
বলেই মন্ত্রীর হেঁসেলে ঢুকে চেঁচাতে থাকব ঃ
শিগগীর অপারেশন টেবিলে চলুন
আপনার হৃদয় বদল করা হবে !
তারপর শিস দিতে দিতে
সূর্যের মুখে ভুসোকালি ছুঁড়ে
মাতৃসদনের দরজায় এসে লাথি মেরে বলব ঃ
বেজন্মা জল্লাদ
ভুল করে আমাকে তুই
কোন্ ভুল ঠিকানায় পাঠিয়েছিস
আমি পুনর্জন্ম চাই
আমি পুনর্জন্ম চাই…

গৌতম গুহ

ঘর বাঁধছে

কাল বিকেলে ছিন্নভিন্ন
রাত চলে যায়, বসন্তও
তথাপি আমি আশায় আশায় ছিলাম।
কে না থাকে
কুটো নিয়ে শুক্‌নো ঠোঁটে
পাখির মতো আসবো ঘরে
কে না ভাবে।

খাঁড়ি ঠেলে বাচ্চা সূর্য যখন ওঠে
ডানপিটে মন বলে নাকি ঃ পাল তুলে দে, পাল তুলে দে

এখন ভাবি, কোথায় যাবি
লোনা জল আর সবুজ দ্বীপ ঘুরে ঘুরে কী আনবি
বেভুল হাওয়ায়   ঘুমিয়ে পড় এই বেলা।

কে কান পাতে
মৃত্যু যখন এসেই গ্যাছে দোর গোড়াতে।

তাই তো ফের সর্বনাশ জন্ম নিচ্ছে
কপাল পোড়া গাইতে গাইতে ঘর বাঁধছে
আকাশকুসুম তুলবে বলে পণ ধরছে

পুরুষ এমন হলেই মাগের ঘুম হয় না।

মতি মুখোপাধ্যায়

কেয়ার অফ্ গাছতলা

তার ঠিকানা বলতে কালচে সবুজ ঝাপুর ঝুপুর
একটা গাছ
থোকা থোকা আঙুরের মতো হলুদ ফুল
বারো মাস রোদে ও বাতাসে
বারো মাস জলে ও বিদ্যুতে
গাছতলায় একটা মানুষ।

তাকে পিওন চেনে না, চেনে কিছু পাখি
চালচুলোহীন, সারাদিন ডাকাডাকি
হৈ-হল্লা লেগেই থাকে।

লোকটার চোখে ডাঁটি-ভাঙা চশমা সুতোয় বাঁধা
উলিঝুলি জামা ও ধুতি, মাথায় গামছা
কাঁধে ঝোলাঝুলি
যাতে সাপের খোলস থেকে শুখা রুটি
সব পাওয়া যায়।

তার সামনে রাস্তা, গাড়িঘোড়া, মিছিল ও পতাকা
ফিলমের প্রিয় গান, কুকুরের ডাক
কখনো চলমান গাড়ি থেকে : বন্ধুগণ···

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আশ্রয়

জন্তুর ঘামের গন্ধ। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে আমরা
শেষ অব্দি একটা আস্তাবলে এসে পৌঁছেছি।
এখানে সঞ্চয়িতা জীবন চুষে খাচ্ছে
হাড়-হাভাতে ডাঁশ-মাছিরা।

বিরক্তি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সিপাইদের মতো পিল পিল করে
নেমে আসছে আশ্বাস, অঙ্গীকার এবং প্রত্যয় থেকে ;
গৃহযুদ্ধ-তাড়িত মূল্যবোধের পা গড়িয়ে নামছে
গাঢ় রক্ত ; —হায় পাপ!
বিবেক বলছে :
এই দৃশ্য তুই দেখছিস!

এরপর আমরা যাবো কোথায়?—আস্তাবল তো
মানুষের সংসার হয় না। জন্তুরা সেখানে সারারাত
কাশে, বংশ বৃদ্ধি করে আর পৃথিবীর ঋণ শোধ করে।

এর চেয়ে বরং নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা শুরু করা যাক,
এ যুদ্ধক্ষেত্রটাই আমাদের আশ্রয় হোক।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম

ফেটে যায় বাদামের খোলা
নির্ভুল অঙ্গুষ্ঠ ওঠে নামে
তর্জনীর বৃত্তাকার কঠিন শরীরে গেঁথে যায়
অদৃশ্য অপেক্ষমান জোড়চিহ্ন ঘিরে।
দু'আঙুলে নিম্নমুখী তীব্র চাপ, নাকি ক্রোধ?
মস্তিষ্ক মন্থন করে নেমে আসে প্রান্তিক পেশীতে
রুদ্ধশ্বাস ভূপ্রকৃতি—ফেটে পড়ে নির্বাক বাদাম।

হাত, না কি প্রাচীন অ্যাটিলা?
পাঁচটি স্তম্ভের মত দুর্বিনীত শিলা
ফুলের পাপড়ির ছলে ভুলেও কখনও
চন্দন করেনি নষ্ট, পরায়নি কোন রক্তটিকা।
ভঙ্গিতে নাশের মুদ্রা—কয়েকটি আঙুল
প্রসিদ্ধ গঙ্গার তীরে ভেঙে যায় অনন্ত বাদাম।

আশিস সান্যাল

এ কোন ভারতবর্ষ

উদ্‌ভ্রান্ত নীলিম হাওয়া।
যতদূর উদ্ভাসিত বিপুল প্রান্তরে
ভাঙনের প্রতিধ্বনি।
যেদিকে তাকাই—
বিপুল ঝঙ্কার বেগে বনরাজিনীল ভয়ানক আন্দোলিত
সর্বত্র ভীষণ সমুদ্র মেঘের শব্দ
শব্দ……শব্দ
চতুর্দিকে ভাঙনের শব্দিত বিষাণ নিনাদিত পর্বতে প্রান্তরে

এ কোন ভারতবর্ষ? অগ্নিগর্ভ স্বদেশ আমার?
এ কোন কাঙ্খিত দিন ঝড়ের প্রহারে
দিকে দিকে কল্লোলিত?
কোথায় উন্মুখ আমি?
নতুন ফুলের দুর্লভ সাধনা চেয়ে কোথায় এলাম?

ফিরে যাবো? কোনদিকে ফিরে যাবো আজ?
যতদূর চাই কম্পমান পটভূমি।—
সর্বত্র ভয়াল দৃশ্য।
কালের রাখাল যেন বা অন্তিম দৃশ্যে স্থির দ্বিধাহীন;
তাহলে সংশয় থাক।
        গর্জে ওঠো নিমগ্ন হৃদয়—
                কঠিন প্রস্তর ভাঙো,
ব্যর্থতার নিবিড় কুয়াসা চূর্ণ করে চৈতন্যের অমোঘ আঘাতে
গড়ে তোল প্রত্যাশার স্থির পটভূমি।

নবনীতা দেবসেন

ও কিছু নয়

কী হলো কি, ভয় পেলি কি, খুঁজছিলি কি গলি ?
গলি কোথায়, সামনে দেয়াল, পিছন দিকে পুলি···(শ্‌শ্‌শ্‌···)
গুড়ুম্‌ করে শব্দ হলো তুড়ুম্‌ করে গুলি (ঈশ্‌শ্‌···)
কী হলো কি, ভয় পেলি কি, মুখে যে নেই বুলি ?
—ও কিছু নয়,—গুলি।

বাসের মধ্যে বসে আছিস
বাবুর হুকুম—"করবে আফিস"
এমন সময়—ধাড়াম্‌ম্‌ !!
পড়লো বুঝি আকাশ ভেঙে ? বাবু কোথায় ? হা রাম !
জ্বলছে আগুন, ভূতুগৃহে অনন্তকাল কোমা—
ও কিছু নয়,—বোমা।

ধুস্সুম্‌-ধুস্সুম্‌ আওয়াজ এবং উস্সুম-কুস্সুম হাওয়া—
টুপুস্‌ টাপুস্‌ ঝরছে ভুঁয়ে বেকার আসা-যাওয়া

ট্রামের ভেতর বাসের ভেতর রাস্তায়, ফুটপাথে
ইদিক সিদিক ছিটিয়ে আছে চিৎ, উপুড়, এককাতে—
বুকে যীশুর চিহ্ন
আর মগজ ছিন্নভিন্ন

কী হ'লো রে ? চম্‌কালি যে ?
এইটুকুতেই ডরিস্‌ কি ?
ও কিছু নয়, গোটাকতক মদ্দা-মাদী মনিষ্যি।

আনন্দ ঘোষ হাজরা

চিত্রকল্পের বিরুদ্ধে

কবি দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠলেন।

কবিতার বাঘটি তাঁর কাঁধের ওপর
দুটো থাবা তুলে বলে উঠলো :
'দ্যাখো হে, আমি বাঘ, বাঘই থাকতে চাই
নেতা হ'তে চাইনে :
তাঁদের সঙ্গে আমার কোনোই মিল নেই
এক, বাসস্থান ছাড়া।'
কবি তাঁর কবিতায় বাঘটিকে
রাজনৈতিক নেতার প্রতীক করেছিলেন।

কবি কবিতা লিখতে ভয় পাচ্ছেন
কারণ বীর্নাম বাগানের মতো গাছগুলো
তাঁর স্বপ্নের মধ্যে মিছিল ক'রে আগাচ্ছিলো
তিনি তাঁর কবিতায় যেহেতু
মানুষের কথা বলতে গিয়ে
বৃক্ষের কথা বলেছিলেন।

গাছেরা অবশ্যই গাছের মতো থাকতে চায়
নিদেন পক্ষে কাঠের মতো
গাছেরা বাস্তবিক আকাট হতে চায় না॥

অশোক চট্টোপাধ্যায়

এখানে

এখানে ধূমপান নিষেধ
এখানে জুতো পরে ঢোকা নিষেধ
এখানে সঙ্গে কুকুর আনা নিষেধ

এখানে কেউ ফুল ছিঁড়বেন না ডাল ভাঙবেন না
এখানে কেউ ফিসফাস করবেন না
এখানে কেউ দেয়ালে নিজের নাম লিখবেন না
এখানে কেউ থুতু ফেলবেন না

এখানে ছবি তোলা নিষেধ
এখানে বনভোজন করা নিষেধ
আবর্জনা নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলুন
আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলুন
রোগ জীবাণু ছড়াতে দেবেন না

এখানে কেউ অযথা ভীড় করবেন না
এখানে ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়ান
সুযোগ পেলে এগিয়ে যান
নিজে এগিয়ে যান ও অপরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন
এখানে কেউ অযথা ভীড় করবেন না

এগিয়ে যান ও এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বিদায় নিন
আপনার উপস্থিতি স্মরণীয় হোক
যাবার আগে নির্দিষ্ট খাতায় নিজের নাম ও ঠিকানা
স্পষ্ট করে লিখে যান
দেয়াল নোংরা করবেন না

দয়া করে এখানে কেউ ফুল ছিঁড়বেন না
থুতু ফেলবেন না
সঙ্গে কুকুর আনবেন না

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

রক্ত একই রক্ত

অন্ধকারে। বুকে ছুরিটা। অন্ধকারেরই বুকে
লম্বা লম্বা পা টুকরো টুকরো গান আর বাড়ি

সেই কেউ সারারাত আলো জ্বেলে খাবার ঢেকে।
আর একজন বিছানায় এপাশ ওপাশ।

তারপর ভোর। আকাশ আর রক্ত।
মায়ের শাড়ির পাড় আর রক্ত।
কারো নিজের হাত আর রক্ত।
আঙুলগুলো আর ছুরি আর রক্ত।
একটা লাল ব্যাঙ লাফ দিয়ে পথ থেকে ঘরে।

একজনের সিঁথি কাল সারারাত থিরথির।
রক্ত ঝরতে ঝরতে সাদা।

কার ইচ্ছে হল সেই ছুরিটা খুঁজে নিয়ে
বুকের ভেতরটা দেখে নেয়।
কি আছে? রক্ত? নিজের রক্তের রঙ? না কি অন্য কিছু

শহীদ মিনারের পথে মিছিল।
লোকে লোকে লম্বা সাদা সিঁথি
পতাকা আর পতাকা আর লাল ছুরি
আর লাল মাখানো ছুরি।

মা, তোমার একজন বাড়ি ফিরে এসেছে।
মা, তোমার একজন ভাই বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি।

শান্তনু দাস

আকাট

আমার বাড়ির চারপাশ ফুঁড়ে বেরুচ্ছে স্কাইস্ক্র্যাপার। তার ওপর এ্যান্টেনার চাঁদোয়া। মাজা ভেঙে যাচ্ছে আমার ঘরের। বুনো হাতির পায়ের থাবায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ফ্রাঙ্কিপাইল কতোদিন কদম ফোটেনা কলকাতায় কিংবা প্রজাপতি। শিশুবর্ষে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে দেখছে এপারের ল্যাংটো ছেলেটা। সাহেব শহরে চাবুক মারা হিমে দেহ সেঁকে নিচ্ছে মানুষ মানুষী। হা শহর, হায় আমার কলকাতা! তোমার হৃদপিণ্ড ভেঙে মাকুর মতো আসবে যাবে ঝলমলে বগী। তারপাশে অন্ধকারে খদ্দেরের আশায় যৌবন। আর আমার মা ঢুলতে ঢুলতে ভাববে—লঝঝর নড়বড়ে ছেলেটা আজ ফিরবে তো?···আমি ফিরি। আমাকে ফিরে আসতে হয় এবং আসতে আসতে ঝাপসা চোখে দেখি কে বা কারা আমার দেয়ালে এঁকে দিয়ে গেছে পতাকা। কখনো সবুজ কখনো নানান রঙ কখনো বা টকটকে লাল। আমি শালা আকাট আমি আঁকতে কিংবা মুছতে কিছুই জানিনা। আমার বুকের মধ্যে একটা ঘূর্ণী পাক খেতে খেতে আকাশে মিলোয়। হাইটেনশন তারে চালঅলা ছেলেটার মতো পুড়ছে আমার শরীর। তখন মনে পড়ছিলো সেই মানুষগুলোর কথা। এক উরু কাদায় ডোবানো দুটো পা। একদিকে ডাঙা। থাবা। লেপ্টে আছে জোঁক। গোক্ষুরের ফণা সামলে কেমন করে বাইছে সময়।···এরা পোষ্টার বোঝে না।

মৃণাল বসু চৌধুরী

আতঙ্কবিহীন ঘুম

দরোজায় শব্দ হ'ল   যাই
কে এলে রাখাল
নাকি ডোম
ধুলোমাখা এই দেহ নিয়ে
কিসের উৎসব হবে ভাই
মোহনায় নৌকা তো রয়েছে আরো
আছে বালিয়াড়ি
গোধূলি উজান
সুখী বীজাণুর কাছে প্রতারিত
ভঙ্গুর শরীরে আর
সামিয়ানা নয়
দাও ঘুম

দরোজায় শব্দ হ'ল   যাই
অসময়ে কে এলে আবার
ব'সো পদতলে
অথবা শিয়রে
অন্ধকারে আবিষ্ট জোয়ারে
দাও ঘুম
একটু ঘুমোতে দাও
নক্ষত্রের নীচে একা
আতঙ্কবিহীন

শিশির গুহ

কেন

কাল রাতে শঙ্খিনী সাপের শব্দে
ঘুম ভেঙেছিল অকস্মাৎ ; চতুর্দিক অন্ধকার
দূরে জোনাকির চোখ জ্বলে এখানে-ওখানে।
গুলঞ্চলতার মত বুকের ভেতরে—
শিহরণ খেলে যায় রক্তের পাথারে।
রাতে আর ঘুমাতে পারিনি দীর্ঘক্ষণ
মাধবীলতার গন্ধ বারবার জানলায়
উঁকি দেয় ক্লান্তির আমেজে।

রক্তের ভেতরে বুঝি শঙ্খিনীর শব্দ আছে ?
তা না হোলে তুমি আমি ক্রমান্বয়ে ক্লীব কেন
শ্মশান ভূমিতে ? কেন সত্য ক্রমশঃই নিম্নগামী ?
জুজুর তাড়না বাজে সর্বক্ষণ বুকের ভেতরে।
বনস্পতি, উদার আকাশ, সমুদ্রের নীল
তোমরাও মানুষকে চিনে গেছ বুঝি ?

ভাস্কর চক্রবর্তী

প্রার্থনা

কালো মেঘ, তুমি এসো
এ-সভ্যতা ধুয়ে-মুছে দাও

আজ চারিদিকে শুধু
নীরস ভদ্রতা।
এবার শুকনো হাসি
শেষ হোক—তুমি এসো

মানুষ নিজের ঘরে ব'সে
কাঁদুক আবার।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার সত্যি আমার মিথ্যা

বিকেলে ছুটির পর অফিসের দো-তলায়
উড়ন্ত পাখীর মতো অনেকটা নাচলাম একা।
বারান্দার নীচে বালীগঞ্জের চলচ্ছল যুবক-যুবতী মিথ্যা
শীতের দুপুরে কিশোরী ঘাসের উপর
লাল বল নিয়ে কয়েকটি শিশুর ছোটাছুটি মিথ্যা
ঐ শহীদ-মিনারের দীর্ঘ ছায়ায় একটি ভিখিরীর আর্তনাদ মিথ্যা
ইন্দিরা গান্ধী মিথা
জ্যোতি বসু মিথ্যা
নকশালবাড়ি মিথ্যা
গাঁ-গঞ্জের লাখো মানুষ,
ওগো তোমাদের বড় ভালোবাসি
আছড়ানো ঢেউ-এর মতো মিটিং-মিছিলে
কলকাতায় তোমাদের ছুটে আসা মিথ্যা।
বাসের চাকায় পিষে যাওয়া ফুলের রক্তে লাল রাজপথ সত্যি
শো-রুমের টি.ভি-তে লুকিয়ে সিনেমা দেখছে ভিখিরী-বালক—এইসত্যি
বেতবনে শহীদের দীর্ঘশ্বাস সত্যি
বেশ্যার হাসিতে লুকনো ক্রোধ সত্যি
দারুণ রোদ্দুরে প্রেমিকার জন্যে যুবকের দাঁড়িয়ে থাকা সত্যি
আমার ম'রে যাওয়া বেঁচে থাকা ম'রে যাওয়া বেঁচে থাকা
টোপায় টোপায় শুধু ম'রে যাওয়া-এই সত্যি।
ইন্দিরা গান্ধী জ্যোতি বসু নকশালবাড়ি মিথ্যা
শুধু সত্যি আমার ম'রে যাওয়া
আর ভয়ংকর বর্ষায় ময়দানের বুকের উপর
ভিজে যাওয়া, একা একা শুধু ভিজে যাওয়া।

শ্যামলকান্তি দাস

সমাজ ভাঙার শব্দ

অশোকতরুর গানে জটিল আওয়াজ দিয়ে
তিনজন রকবাজ সমাজ ভাঙছে
অন্ধকারে আড়ালে-আবডালে !
চরণচিহ্ন রেখে শেষ গাড়ি চলে যায়
নিবে আসে অশনিসংকেতের আলো.
এমন শীতের রাতে সমাজ ভাঙার শব্দ, ঠকঠাক ঠকঠাক.
অন্ধকারে জ্যোৎস্নায় শহর কাঁপায় !
ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দম্পতির বিছানায়
সংকুচিত ভীরু চাঁদ, ঠাণ্ডা মরা শরীরেও রাত্রি রাখে
মর্মরধ্বনিত কিছু ছোপছাপ—
আর পরমাত্মাবাহী ক'টি ডেঁয়ো পিঁপড়ে
উচ্ছিষ্ট ফুচকার ঠোঙায়
ছিবড়েস্মুদ্ধ সমাজের পিত্ত কফ গন্ধ খুঁজে পায় !